দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 2 8 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষাচিত্র সুষ্ঠু ও সমন্বিত হোক

বছর শেষে শুরু হয়েছিল ভর্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ এক মাস ধরে দেশের প্রধান প্রধান নগরীর স্কুলগুলোতে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই যুদ্ধ। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা এই যুদ্ধে প্রতিবছর যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন, তা শুধু অভাবনীয় নয়, অকল্পনীয়ও বটে। একমাত্র ভুক্তভোগীরাই এর তিক্ত স্বাদ পেয়ে থাকেন।

বেশ কিছুদিন হয় অতিক্রান্ত হয়েছে সেই সময়। এখন শিক্ষার্থীদের বিভু হয়ে শান্ত পরিবেশে পড়াশোনা শুরু করার সময়। কিন্তু এ রকম অনুকূল পরিবেশ-পরিস্থিতি এখনও আমরা সৃষ্টি করতে পারছি না। ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও অন্যান্য সমস্যা শিক্ষার্থীদের স্থির হতে দিচ্ছে না। অভিভাবকরা ভুগছেন নানা উদ্বেগ-আশঙ্কায়।

এ মুহূর্তে চলছে পবিত্র রমজান মাস। রমজানের পর পুরোদমে শুরু হবে ক্লাস— এ রকমই প্রত্যাশা সবার। কিন্তু ক্লাস শুরু হলেও শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছবে কি প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক? ইতোমধ্যে পত্রপত্রিকায় এ সম্পর্কে আশঙ্কাজনক খবর প্রকাশিত হয়েছে। সরকারের পরিকল্পনা ছিল, এ বছর জানুয়ারিতে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো হবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে এখন ভেস্তে যেতে বসেছে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে, ঈদের ছুটি শেষ হবার আগে কোন বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানো যাবে না। এ সংবাদ নিঃসন্দেহে উদ্বেগের।

স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছে দেয়ার প্রধান দায়িত্ব টেক্সট বুক বোর্ডের। গত বছর জুলাইতে এ সংক্রান্ত নতুন একটি খবর প্রকাশিত হয় বিভিন্ন দৈনিকে। ঐ খবরে এমন বলা হয়েছিল যে, টেক্সট বুক বোর্ড নতুন পাঠ্যবই প্রকাশের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে— ১৯৯৬ সাল থেকে যা বাস্তবায়িত হবে। অনেক দিন থেকেই নতুন পাঠ্যবই প্রকাশিত হোক— এ রকম একটা নীরব দাবি ঘনিয়ে উঠেছিল শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশের সচেতন মানুষের মনে। কারণ বিশেষজ্ঞদের ধারণা, যে কোন সাধারণ বিষয়ের বই (বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি সংক্রান্ত বই নয়) পাঁচ বছর পেরুলেই বাতিলের যোগ্য হয়ে যায়। বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি সংক্রান্ত বই এক্ষেত্রে বছর না পেরুতেই পুরনো হয়ে যায়। ফলে যে কোন সাধারণ বিষয়ের বইগুলোর অন্তত পাঁচ বছর পর পর নতুন সংস্করণ হওয়া উচিত। কখনও কখনও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য পুরনো বইয়ের কাঠামো বদলে ফেলে প্রকাশ করা দরকার নতুন ধরনের বই, নতুন পরিকল্পনার অধীনে। গত বছর তাই যখন নতুন পরিকল্পনার অধীনে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ঘোষণা প্রচারিত হয়, তখন অনেকেই সেই ঘোষণায় আশান্বিত হয়েছিলেন। দেশ ও কালোপযোগী বই শিক্ষার্থীরা হাতে পাবে বলে ধারণা করেছিলাম আমরা। কিন্তু নতুন বছরের শুরুতে মনে হচ্ছে, ঐ সংবাদ আরও কিছুকাল অশ্রুভিন্ন হয়েই থাকবে। ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর ক্ষেত্রে নতুন পাঠ্যক্রম শুরু হলেও এই দুই শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ঈদের আগে নতুন বই হাতে পাবে না। পুরনো বই কিনেও যে তাদের শিক্ষাক্রম চালিয়ে যাবে, তারও উপায় নেই। ফলে বছরের শুরুতেই পাঠ্যপুস্তকহীন থাকতে হবে তাদের। এই সমস্যা হয়ত এখনও খুব প্রকট নয়। কিন্তু সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার যে নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত ছিল, সেই নীতির বাস্তবায়ন টেক্সট বুক বোর্ড করতে পারেনি। ফলে সাথ সাথ শিক্ষার্থীকে এক অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হলো। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নতুন পাঠ্যক্রমের বইয়ের পাণ্ডুলিপি সময়মতো প্রস্তুত করে প্রকাশের জন্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় সৃষ্টি হলো এই সঙ্কট।

পাঠ্যবই প্রকাশের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বেসরকারী প্রকাশকরাই এই

মাসুদুজ্জামান

অভিযোগ তুলেছেন। সঙ্কট মোকাবিলার জন্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে একটি "জরুরী বিজ্ঞপ্তি" পাঠিয়েছে। ঐ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ষষ্ঠ শ্রেণীর সহপাঠ, নবম শ্রেণীর ইংরেজী ও সহপাঠ বই বর্তমান শিক্ষাবর্ষেও চালু থাকবে।

বিজ্ঞপ্তির ঐ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না। নতুন গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়নে তারা এখন কতটা সফল হতে পারবে, তাই নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়।

নতুন পাঠ্যক্রমের যখন এ রকম বেহাল অবস্থা, তখন এই খবরের সঙ্গে যুক্ত হলো আরও একটি উদ্বেগের খবর।

কালোবাজারে বিক্রি হচ্ছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মুদ্রিত বিনামূল্যে বিতরণের বই। গত ২৩ জানুয়ারি রাজধানীর বাংলাবাজার এলাকায় খোলাবাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছিল এসব বই। বোর্ডের ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই কালোবাজারীর সঙ্গে যুক্ত বলে গোয়েন্দা পুলিশ তথ্য দিয়েছে। এই ধরনের অভিজ্ঞতা কোন সন্দেহ নেই উদ্বেগজনক। অভিভাবকদের যদি বিনামূল্যের বই কালোবাজার থেকে কিনতে হয়, তাহলে এই ধরনের পাঠ্যবই সরবরাহের নেটওয়ার্কের ওপর যে কর্তৃপক্ষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই তা সহজেই বোঝা যায়। বছরের শুরুতে বিনামূল্যে বিতরণের পাঠ্যবই কালোবাজারে বিক্রি হবার ঘটনা একেবারে নতুন নয়, কিন্তু তারপরও এই ঘটনা কী বছর কি করে ঘটে সেটাই বিস্ময়ের।

টেক্সট বই নিয়ে এই রকম দৃষ্টি আকর্ষক খবর প্রকাশের পাশাপাশি আরও একটি খবর বেশ কিছুদিন ধরে দেশের শিক্ষাঙ্গনকে উত্তেজিত করে রাখছে। চার বোর্ডের অভিন্ন প্রশ্নপত্রের প্রশ্নে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে। রাস্তা অবরোধ থেকে শুরু করে গাড়ি ভাঙচুরের মতো ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে তারা। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে এ রকম একটি পদক্ষেপ যে অত্যন্ত জরুরী ছিল, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অভিন্ন প্রশ্নপত্রের অধীনে উচ্চ মাধ্যমিকের সকল শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিলে মেধার সামগ্রিক মান যাচাই যে সহজ হবে, তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা আজ আতঙ্কগ্রস্ত। তারা ভাবছে অভিন্ন প্রশ্নপত্র হলে তাদের সিলেবাসের বাইরে থেকে হয়ত প্রশ্ন হবে অথবা কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। যেমন রাজশাহী বোর্ডের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত ঢাকা বোর্ডের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, অথবা কুমিল্লা বোর্ডের সিলেবাস থেকে যে প্রশ্ন হবে সে সিলেবাস হয়ত যশোর বোর্ডের জন্য নির্ধারিত নয়। এই ধরনের আশঙ্কা যদি আগামী উচ্চ মাধ্যমিক প্রশ্নপত্রে প্রতিফলিত হয়, তাহলে ঘটনাটি হবে সত্যি দুঃখজনক, অপ্রত্যাশিত। এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ মহল বা যারা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে জড়িত তাদের ধারণা— সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

আর "গুরুত্বপূর্ণ" বলে কোন কথা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ নির্ধারিত পুরো সিলেবাসের যে কোন অংশ থেকে প্রশ্ন হতে পারে। এতদিন শিক্ষার্থীরা "সাজেশন" বলে যে জিনিসটির অধীনে পড়াশোনা করে এসেছে, তা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাপার ছিল না। শিক্ষার্থীদের এতাবে পড়ে আসার যে রীতিটি চালু আছে, তার অবসান হওয়া দরকার। শিক্ষার্থীদের কাজ হচ্ছে নির্ধারিত সিলেবাসের সবটা পড়া। এবার থেকে সেভাবেই প্রশ্ন হবে— অর্থাৎ প্রশ্ন এখন থেকে "রিপিট" হবে। সুতরাং শিক্ষার্থীরা অভিন্ন প্রশ্নপত্রের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করছে তা অযৌক্তিক।

সংশ্লিষ্টদের এই যদি হয় ভাষ্য, তাহলে বলতে দ্বিধা নেই, অভিন্ন প্রশ্নপত্রের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা আজ একটা অযৌক্তিক স্নায়বিক উত্তেজনায় ভুগছে। তবে সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে দ্রুত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া উচিত। তাদের জানিয়ে দেয়া উচিত— অযৌক্তিক, বিধিবহির্ভূত কোন কিছুই তারা করতে যাচ্ছে না।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আসলে আজও সমন্বিত, সুষম বা সুষ্ঠু হতে পারেনি। একদিকে অব্যবস্থা, দুর্নীতি এবং অন্যদিকে গৃহীত ব্যবস্থার যৌক্তিকতা তুলে ধরতে না পারায় এ ক্ষেত্রে সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার অব্যবস্থাজনিত কারণে শিক্ষার্থীরা নতুন কোন ব্যবস্থা গৃহীত হলেই তাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে— সব ধরনের বিভ্রান্তি দূর করে যুগোপযোগী, সুষ্ঠু, সুষম শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখা। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সচেতন থাকবে বলে আমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি।